بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৩ মে, ২০২৪ মোতাবেক ০৩ হিজরত, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

'গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ' এর উল্লেখ হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মদীনা এবং হামরাউল আসাদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে যা চয়ন করেছেন তা বর্ণনা করছি।

তিনি (রা.) লিখেন, এই রাত অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের রাত খুবই ভীতিপূর্ণ একটি রাত ছিল। কেননা বাহ্যত কুরাইশ সেনাদল মক্কার পথে যাত্রা করলেও এই আশঙ্কা ছিল যে তাদের এই কাজ মুসলমানদের অসর্তক করার অভিপ্রায়ে ছিল। আশঙ্কা ছিল যে, তারা অকস্মাৎ ফিরে এসে মদীনার ওপর আক্রমণ করে বসবে। তাই এই রাতে মদীনায় পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। আর বিশেষভাবে সাহাবীরা সারা রাত মহানবী (সা.)-এর বাড়ি পাহারা দেন। সকালে জানা যায়, এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না; কেননা ফজরের নামাযের পূর্বে মহানবী (সা.) এই সংবাদ পান যে, কুরাইশ সেনাদল মদীনা থেকে কয়েক মাইল পথ পার হয়ে যাত্রাবিরতি দিয়েছে এবং কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মাঝে এই বিতর্ক চলছে, এই বিজয়ের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মদীনার ওপর কেন আক্রমণ করা হবে না! আর কতিপয় কুরাইশ পরস্পরকে বিদ্রুপ করছিল, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-কেও হত্যা করো নি, মুসলমান মহিলাদের দাসীও বানাও নি কিংবা তাদের ধন-সম্পদ করতলগতও করো নি, বরং তোমরা যখন তাদের ওপর বিজয়ী হলে এবং তাদেরকে নির্মূল করার সুযোগ লাভ করলে তখন তোমার (কিছু না করে) তাদেরকে এভাবেই ছেড়ে ফিরে গেলে যেন তারা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। কাজেই, এখনও সুযোগ আছে, ফিরে চলো আর মদীনায় আক্রমণ করে মুসলমানদের মূলোৎপাটন করো। এর বিপরীতে অন্যরা বলছিল, তোমরা একটি বিজয় অর্জন করেছ– একেই বড়ো প্রাপ্তি জ্ঞান করো এবং ফিরে চলো। পাছে এমন যেন না হয় যে, এই সম্মানও আবার খুইয়ে বসো এবং এই বিজয় পরাজয়ে বদলে যায়। কেননা, এখন যদি তোমরা ফিরে গিয়ে মদীনায় আক্রমণ করো তাহলে নিঃসন্দেহে মুসলমানরা প্রাণপণ লড়াই করবে আর যারা উহুদে যোগদান করে নি তারাও রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু অবশেষে অত্যুৎসাহী লোকদের মতামত প্রাধান্য লাভ করে আর কুরাইশরা মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) এসব ঘটনা অবগত হওয়ামাত্রই ত্বরিত মুসলমানদের প্রস্তুত হওয়ার জন্য ঘোষণা দেন; কিন্তু পাশাপাশি এই নির্দেশও দেন যে, (এই ইতিহাস আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি, কিন্তু এখানে কিছু অতিরিক্ত তথ্য আছে তাই পুনরায় বর্ণনা করছি;) উহুদের যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা ছাড়া অন্য কেউ আমাদের সাথে যাবে না। অতএব উহুদের যুদ্ধে যোগদানকারী মুজাহিদগণ, যাদের মধ্যে অধিকাংশই (গুরুতর) আহত ছিলেন, (তারা) নিজেদের ক্ষতস্থান বেঁধে নিজেদের মনিবের সঙ্গে রওয়ানা হন। লেখা রয়েছে যে, এ সময় মুসলমানরা এরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যাত্রা করেন যেভাবে কোনো বিজয়ী সেনাদল বিজয়ের পর শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়। আট মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে

তিনি (সা.) 'হামরাউল আসাদে' পৌঁছেন, যেখানে দুজন মুসলমানের মরদেহ ময়দানে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অনুসন্ধানে জানা যায়, তারা সেই দুজন গোয়েন্দা ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) কুরাইশের পেছনে প্রেরণ করেছিলেন, আর সুযোগ পেয়ে কুরাইশরা তাদেরকে হত্যা করেছিল। মহানবী (সা.) একটি কবর খনন করিয়ে এই শহীদদ্বয়কে তাতে একত্রে সমাহিত করেন। আর এ পর্যায়ে যেহেতু সন্ধ্যা নেমে এসেছিল তাই তিনি (সা.) সেখানেই শিবির স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, ময়দানের বিভিন্ন স্থানে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হোক। অতএব, দেখতে দেখতে হামরাউল আসাদ প্রান্তরে পাঁচশ' অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়, যা দূরবর্তী প্রত্যেক দর্শকের হৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টি করতো। সম্ভবত এই সময়েই খুযাআ গোত্রের মা'বাদ নামের জনৈক মুশরিক নেতা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং তাঁর (সা.) কাছে উহুদের নিহতদের সম্পর্কে সহানুভূতি প্রকাশ করে আর এরপর নিজের পথ ধরে। পরের দিন সে রওহা নামক স্থানে পৌঁছে সেখানে কুরাইশ বাহিনীকে অবস্থান করতে দেখে যারা মদীনা অভিমুখে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মা'বাদ ত্বরিত আবু সুফিয়ানের কাছে যায় এবং তাকে গিয়ে বলে, তোমরা কী করতে যাচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি এখনই মুহাম্মদ (সা.)-এর বাহিনীকে হামরাউল আসাদে রেখে এসেছি আর এরূপ ত্রাসসঞ্চারী বাহিনী আমি কখনো দেখি নি। উহুদের পরাজয়ের অনুশোচনায় তাদের মাঝে এরূপ উত্তেজনা বিরাজ করছে যে, তোমাদের দেখামাত্রই ভস্মিভূত করে দেবে। আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের ওপর মা'বাদের এই কথার এমন প্রভাব পড়ে যে, তারা মদীনা অভিমুখে ফেরত যাবার সংকল্প পরিত্যাগ করে শীঘ্রই মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। মহানবী (সা.) কুরাইশের এভাবে পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ অবগত হলে খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, **'এটি খোদা তা'লার প্রতাপ যা তিনি কাফিরদের হৃদয়ে সঞ্চার করে দিয়েছেন।'**

যেমনটি আমি বলেছি, এর বিশদ বিবরণ আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি; এটি ছিল এর সারমর্ম। এরপর মহানবী (সা.) হামরাউল আসাদে (আরও) দুই-তিন দিন অবস্থান করেন এবং পাঁচ দিন অনুপস্থিতির পর মদীনায় ফেরত আসেন। এই অভিযানে কুরাইশের দুজন সৈন্য, যাদের মাঝে একজন ছিল বিশ্বাসঘাতক আর অপরজন ছিল গুপ্তচর– (তারা) মুসলমানদের হাতে আটক হয়। যুদ্ধনীতি অনুযায়ী তাদের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড, তাই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তাদেরকে হত্যা করা হয়। তাদের মাঝে একজন ছিল মক্কার বিখ্যাত কবি আবু উয্‌যা যে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে আটক হয়েছিল। অতঃপর তার ক্ষমাপ্রার্থনা এবং সে আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না মর্মে অঙ্গীকারের পর মহানবী (সা.) কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতা করে পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে আর কেবল সে নিজেই যুদ্ধে যোগ দেয় নি, বরং সে তার উস্কানিমূলক কবিতার মাধ্যমে অন্যদেরকেও প্ররোচিত করে। যেহেতু এমন মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা মুসলমানদের জন্য চরম ক্ষতির কারণ হতে পারত তাই পুনরায় যখন সে মুসলমানদের হাতে আটক হয় তখন মহানবী (সা.) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। আবু উয্‌যা আবারও আগের মতো মৌখিক ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে মুক্তি পেতে চেয়েছিল, কিন্তু মহানবী (সা.) একথা বলতে বলতে (তার) আবেদন নাকচ করে দেন যে, لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِن جُحْرٍ واحِدٍ مَرَّتَيْنِ **(লা ইউলদাগুল মু'মিনু মিন জুহরিন ওয়াহিদিন মার্‌রাতাইনি)** অর্থাৎ **মু'মিন এক গর্তে হতে দুবার দংশিত হয় না।**

দ্বিতীয় বন্দি ছিল মুআবিয়া বিন মুগীরা। সে হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-র আত্মীয় ছিল, কিন্তু ইসলামের চরম শত্রু ছিল। উহুদের যুদ্ধের পর সে চুপিসারে মদীনার আশেপাশে ঘুরতে থাকলে সাহাবীরা তাকে দেখে ফেলেন এবং ধরে মহানবী (সা.)-এর সামনে নিয়ে আসেন। তিনি (সা.) তাকে হযরত উসমান (রা.)-র সুপারিশে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছেড়ে দেন যে, তিন দিনের মধ্যে তাকে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, নতুবা আল্লাহ্‌র কসম! গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে। (মুআবিয়াকে প্রথমে সতর্ক করা হয়েছিল যে, তিন দিনের মধ্যে চলে যাও নতুবা তোমার গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। যদি চলে যাও তাহলে ঠিক আছে, নতুবা ক্ষমা করা হবে না।) মুআবিয়া তিন দিনের মধ্যে চলে যাওয়ার অঙ্গীকার করে, কিন্তু এই মেয়াদ পার হওয়ার পরও তাকে চুপিসারে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় আর এ কারণে তাকে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এটি বর্ণিত হয় নি যে, তার পরিকল্পনা কী ছিল? কিন্তু এভাবে চুপিসারে মদীনার এলাকায় অবস্থান করা এবং সতর্ক করা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের পরও অবস্থান করা বলে দেয় যে, সে কোনো ভয়ানক দুরভিসন্ধি নিয়ে সেখানে অবস্থান করছিল। আর অসম্ভব নয় যে, উহুদে মহানবী (সা.)-এর প্রাণে বেঁচে যাওয়ায় সে ক্ষুব্ধ হয়ে মদীনায় মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে এসে থাকবে আর ইহুদী অথবা মদীনার মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে কোনো গুপ্ত হামলা করার অভিপ্রায় লালন করবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেছেন ফলে তার দুরভিসন্ধি কার্যকর হয় নি।

উহুদ যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে অতি দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা রয়েছে। কতক জীবনীকার উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করে। আবার কেউ কেউ এটিকে মুসলমানদের বিজয় বলতে ইতস্তত করে আর এ দুয়ের মধ্যমবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। যদিও কিছু লোক এমন আছে যারা এক পরাজয়ের পর বিজয় হয়েছে বলে মত প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, সে সময়কার যুদ্ধের রীতিনীতি যদি দেখা হয় তাহলে তদনুযায়ী একথা বলা যায় না যে, উহুদ ময়দানে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছিল। এটিকে কীভাবে পরাজয় বলা যেতে পারে অথবা কীভাবে বলা যায় যে, কাফিররা বিজয় লাভ করেছে? মুসলমান তো ময়দানে তখনও উপস্থিত ছিল যখন এক পর্যায়ে আবু সুফিয়ান কেবল স্লোগান দিয়ে নিজ সৈন্যসামন্ত নিয়ে উহুদ ময়দান ছেড়ে মক্কার দিকে যাত্রা করেছিল। সেখানে সে এই অন্তঃসারশূন্য স্লোগানও দিয়েছিল যে, আজকের এই দিনটি বদরের দিনের প্রতিশোধ; অথচ এটিও কেবল তার স্লোগানসর্বস্ব কথা ছিল, বদরের প্রতিশোধ কীভাবে হলো? বদরে কাফিরদের সেনাপতিসহ তাদের বড়ো বড়ো সর্দার নিহত হয়েছিল আর বদরে তাদের সত্তরজন লোক বন্দি হয়েছিল আর বদরে অজস্র গনিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। রেওয়ায়েত অনুযায়ী বদরে বিজয়ী মুসলিমরা (যুদ্ধ শেষে) তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করে, কাফির সেনাদল সেখান থেকে পলায়ন করে। পক্ষান্তরে উহুদের দিন এগুলোর কোনো একটি বিষয়ও কাফিরদের ভাগ্যে জোটে নি। তাহলে এ দিনটি কীভাবে বদরের প্রতিশোধ হলো? সুতরাং উহুদের দিনও কোনোভাবেই মুসলমানদের পরাজয় হয় নি। তবে একথা সত্য যে, প্রথম স্তরে সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের ভয়ানক প্রাণহানীর সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু পরিশেষে মুসলমানরা উহুদ প্রান্তরেই ঠায় অবস্থান করে আর মক্কার কাফিরদের পরিপূর্ণরূপে বিজয় অর্জন করার ক্ষেত্রে অদৃশ্য হাত প্রবল শক্তিবলে বাধা দিয়ে রাখে আর এক সাময়িক বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদেরকে আর কোনো ক্ষতি করা থেকে বঞ্চিত থাকে। তৎকালীন যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী উহুদ থেকে তারা বিফল ও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। আর যদি এর পরবর্তী দিনই হামরাউল আসাদ অভিমুখে

মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনকে এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয় তাহলে উহুদের যুদ্ধ এক দিবালোকের ন্যায় ও সুস্পষ্ট বিজয় হিসেবে প্রতিভাত হয় আর উহুদ ময়দানে পরাজয়ের যে ক্ষণিকের গ্লানি ছিল তা-ও মুসলমানদের জন্য তথা তাদের পরবর্তী যুগের জন্য বহু প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা রেখে গেছে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, স্থায়ী ফলাফলের দিক থেকে উহুদ যুদ্ধের বিশেষ কোনো গুরুত্বই নেই আর বদরের বিপরীতে এ যুদ্ধ কিছুই নয়, কিন্তু সাময়িকভাবে অবশ্যই এ যুদ্ধ কোনো কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের ক্ষতি করেছে। প্রথমত, তাদের তথা মুসলমানদের সত্তরজন লোক এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন যাদের মাঝে কতিপয় জ্যেষ্ঠ সাহাবী ছিলেন, আর আহতের সংখ্যা তো ছিল অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, মদীনার ইহুদী এবং মুনাফিকরা যারা বদরের যুদ্ধের ফলাফলে কিছুটা ভয়ে ছিল, তারা কিছুটা ধৃষ্ট হয়ে ওঠে বরং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা তো প্রকাশ্যে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করল এবং কটূক্তি করল। তৃতীয়ত, মক্কার কুরাইশরা খুব দুঃসাহসী হয়ে উঠল আর তারা মনে মনে ভাবল, আমরা কেবল বদরের প্রতিশোধই গ্রহণ করি নি বরং আগামীতেও যখন দলবেঁধে আক্রমণ করব, তখন মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হব। চতুর্থত, আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোও উহুদের পর আরো ধৃষ্টতার সাথে মাথাচাড়া দিতে লাগল।

কিন্তু এতসব ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ধ্রুব সত্য হলো, বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, উহুদের বিজয়ের পক্ষে সে ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব ছিল না। বদরের যুদ্ধে মক্কার সেই সকল নেতা যারা প্রকৃতপক্ষে কুরাইশ জাতির প্রাণভ্রোমরা ছিল– তারা সবাই নিহত হয়েছিল। যেভাবে পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে, প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে এ জাতির মূল কেটে দেয়া হয়েছিল। আর এই সব অসাধ্য এমন এক জাতির হাতে হয়েছে যারা বাহ্যিক উপকরণের দৃষ্টিকোণে তাদের তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ ছিল। তাদের তুলনায় নিঃসন্দেহে উহুদের প্রান্তরে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু তা তাদের সেই ক্ষতির তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ও সাময়িক ছিল যা বদরের প্রান্তরে কুরাইশের হয়েছিল। মহানবী (সা.) যিনি ইসলামী সমাজের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন এবং যিনি কুরাইশের শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিলেন– তিনি খোদার কৃপায় জীবিত ছিলেন। এছাড়া জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে দু-একজন ছাড়া সবাই নিরাপদ ছিলেন। এছাড়া মুসলমানদের এই পরাজয় এমন এক সৈন্যবাহিনীর বিপরীতে ছিল যারা সংখ্যায় তাদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের দিক থেকেও তারা কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী ছিল।

অতএব, মুসলমানদের জন্য বদরের মহান বিজয়ের তুলনায় উহুদের পরাজয় সামান্য একটি বিষয় ছিল। আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরাজয় মুসলমানদের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়। কেননা এর মাধ্যমে তাদের কাছে এই কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছা ও নির্দেশনার পরিপন্থি পদক্ষেপ নেয়া কখনো কল্যাণের কারণ হতে পারে না। তিনি (সা.) মদীনায় অবস্থানের মতামত দেন, এর বিপরীতে নিজের একটি স্বপ্নও শোনান; কিন্তু লোকেরা মদীনা থেকে বাইরে এসে যুদ্ধ করার ওপর জোর দেয়। মহানবী (সা.) তাদেরকে উহুদের এক গিরিপথে নিযুক্ত করে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যা-ই হোক, তোমরা এই স্থান ছেড়ে যাবে না। কিন্তু তারা গনিমতের সম্পদের চিন্তায় সেই জায়গা ছেড়ে নীচে নেমে আসেন। যদিও এই দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল ছোটো একটি দলের পক্ষ থেকে, কিন্তু যেহেতু মানব সমাজ সবাইকে একটি মালার ন্যায় গেঁথে রাখে, তাই সেই দুর্বলতার ফলে ক্ষতির সম্মুখীন সবাই হয়েছিল। একইভাবে যদি

লাভবান হতো তাহলে সবাই লাভবান হতো। অতএব এটিও একটি নীতিগত বিষয়। কখনও কখনও কয়েকজনের দুর্বলতার কারণে পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একইভাবে লাভের ক্ষেত্রে পুরো সমাজে এক ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এখন আমরা পৃথিবীতে দেখি, আহমদীয়া জামাতের পক্ষে অনেক মানুষ কথা বলে। যদিও শতভাগ আহমদী উচ্চমার্গের বা উচ্চমানের নয়। কিন্তু কিছু এমন আছেন যাদের ভালো প্রভাব রয়েছে যেকারণে অন্যদেরও মানুষ উন্নত মানের বলে মনে করে।

অতএব উহুদের পরাজয় যদি এক দৃষ্টিকোণ থেকে কষ্টের কারণ হয়ে থাকে তাহলে অন্যদিকে এটি মুসলমানদের জন্য একটি কল্যাণকর শিক্ষায় পরিণত হয়েছিল। কষ্টের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি মুসলমানদের পথে কেবল সাময়িক একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। এরপরে মুসলমানরা সেই মহাপ্লাবনের ন্যায় অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে যা কোনো বাধায় আরো তীব্র হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) উহুদের যুদ্ধোত্তর ঘটনাবলির বিশ্লেষণাত্মক বক্তৃতা দিয়েছেন। সেই বক্তৃতার কিছু পয়েন্ট হলো: প্রথমত, মুসলমানদের মাঝ থেকে পরাজয়ের গ্লানি পুরোপুরি দূর করার জন্য এর থেকে আর ভালো কোনো পদক্ষেপ হতে পারতো না যে, তাদেরকে অনতিবিলম্বে নতুনভাবে যুদ্ধের জন্য রণক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, উহুদে অংশ নেয় নি এমন যুবক ও যোদ্ধাদের সাথে যাবার অনুমতি না দিয়ে মহানবী (সা.) নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি (সা.) বাহ্যিক উপকরণের ওপর নির্ভর করতেন না; বরং নিজের সেই দাবি ও বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে, তিনি সত্যিকার অর্থে নিজ প্রভুর ওপর নির্ভর করতেন, আর তিনি তাঁকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান। **তৃতীয়ত,** এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মহানবী (সা.) সেসব সাহাবীর মনস্তুষ্টি করেন যাদের উহুদের ময়দানে পদস্খলন ঘটেছিল এবং তাদের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন যে, তারা প্রকৃত অর্থে পিছু হটার মানুষ ছিলেন না, বরং হঠাৎ তারা অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়েছিলেন। মানব ইতিহাসে যুদ্ধের এমন একটিও দৃষ্টান্ত নেই যেখানে কোনো সেনাপতি তার সৈন্যদের প্রতি এতটা আস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন যখন কি-না সেই সৈন্যরাই কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তাঁকে একা ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এমনভাবে পলায়ন করেছিল যে, গুটিকতক আত্মনিবেদিত সাহসী ব্যক্তি ছাড়া তাঁর পাশে আর কেউ ছিল না। **চতুর্থত,** মহানবী (সা.)-এর এই ভরসা করা শতভাগ সঠিক ছিল আর তা কোনো আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত ছিল না– তা এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনাব্যতিক্রমে উহুদের সেসকল মুজাহিদ পূর্ণ দৃঢ়চিত্ততা ও প্রেরণা নিয়ে চরম ভয়ংকর এই যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগ দেন যাদের মাঝে হাঁটার শক্তিও ছিল না। আর একজন ব্যক্তিও একথা বলে মুখ ফিরিয়ে নেন নি যে, এ অভিযান তো আত্মহত্যার নামান্তর কিংবা এ প্রশ্নও করেন নি যে, একবার বড়ো কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে বের হওয়ার পর আবার সেই শক্তিশালী ও অত্যাচারী শত্রুর ফাঁদে নিজে নিজে ধরা দেয়া কোথাকার বুদ্ধিমত্তা?

উহুদের দ্বিতীয় দিনেই মহানবী (সা.)-এর শত্রুদের পিছুধাওয়ায় বের হওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর সাহাবীদের প্রতি এত বড়ো একটি অনুগ্রহ ছিল– যা কোনো সেনাপতি তার সেনাবাহিনীর প্রতি প্রদর্শন করে নি, অর্থাৎ তাদের প্রশ্নবিদ্ধ আচরণের এক নিমিষে সুন্দর সমাধান করেছেন। اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وبارك وسلّم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)। **পঞ্চমত,** পরববর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর এই পদক্ষেপ কেবল মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক কল্যাণরাজিই নিজের মাঝে

রাখতো না বরং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল আর এর ফলে শত্রুরা আরেকটি ভয়ংকর আক্রমণ করা থেকে বিরত রইল, বরং এমনভাবে ফিরে গেল যে, বিজয় লাভের পরিবর্তে মারাত্মকভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। কোনো অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে মহানবী (সা.) কেবল নিজের প্রজ্ঞা ও সুপরিকল্পনার কল্যাণে সুমহান বহু কল্যাণরাজি লাভ করেন। তিনি (রাহে.) লিখেন, যদিও মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধগুলো বিশ্লেষণ করলে তাঁর (সা.) চমৎকার ও অনন্য যোগ্যতার আশ্চর্যজনক চিত্র ফুটে ওঠে যা একজন সেনাপতি হিসেবে তাঁর (সা.) সত্তায় পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) একজন সমর বিশেষজ্ঞের মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হন নি বরং তিনি একজন চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক নেতার পদমর্যাদা রাখতেন যাঁর হাতে উন্নত নৈতিকতার পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উত্তম চরিত্রের পতাকা সমুন্নত রাখা এবং উড্ডীন করার পর যে মহান জিহাদে তিনি (সা.) রত ছিলেন তা এমন এক নিরবচ্ছিন্ন ও অনন্ত সংগ্রাম ছিল যা শান্তির যুগেও অবিকল সেভাবে বিদ্যমান ছিল যেমনটি ছিল যুদ্ধের অবস্থায়। দিনের বেলায় তিনি (সা.) এ পতাকার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং রাতের বেলায়ও। শত্রুরা অসংখ্যবার তাঁকে (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের প্রচণ্ড শারীরিক আঘাতে জর্জরিত করতে এবং যন্ত্রণাদায়ক আঘাত হানতে সক্ষম হয়, কিন্তু উন্নত চরিত্রের এই পতাকায় কখনো তিনি (সা.) সামান্যতম আঁচড় লাগতে দেন নি এবং এটিকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেন নি। এতৎসত্ত্বেও তাঁর (সা.) যে উন্নত চরিত্র ছিল তা সর্বদা দৃশ্যমান ছিল। সেই সময়েও এ পতাকা তাঁর (সা.) পবিত্র হাতে অত্যন্ত মহিমার সাথে গগনচুম্বী ছিল যখন তাঁর (সা.) শরীর প্রচণ্ড আঘাতে জর্জরিত ও নিস্তেজ হয়ে উহুদের সেই কঙ্করময় ভূমিতে পতিত হচ্ছিল। সেই সময়েও এ পতাকা এক অভাবনীয় ভ্রুক্ষেপহীতায় তাঁর (সা.) হাতে উড্ডীন ছিল যখন চারদিকে সাহাবীদের দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ভূপাতিত হচ্ছিল। অতএব উহুদের যুদ্ধে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সেসব সাথি সাহাবীদের চারিত্রিক জিহাদ, যারা তাঁর সঙ্গী ছিল– একইসাথে অত্যন্ত জোরালোভাবে অব্যাহত থাকে এবং মহান বিজয়ী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি চারিত্রিক যুদ্ধে মহান বিজয় লাভ করেন। তিনি (সা.) এসব ভয়ানক ভূমিকম্পের মাঝ থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এসেছেন যা নৈতিক চরিত্রের অত্যন্ত শক্তিশালী ভবনগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, 'উহুদের যুদ্ধে যদিও বিজয়ের পর পরাজয়ের দিক সামনে আসে, তথাপি এ যুদ্ধ সত্যিকার অর্থে মহানবী (সা.)-এর সত্যবাদিতার এক অনেক বড়ো নিদর্শন। রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের বিজয় লাভ হয়। এরপর রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর (সা.) প্রিয় চাচা এ যুদ্ধে শহীদ হন। রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যুদ্ধের প্রারম্ভে কাফিরদের পতাকাবাহী নিহত হয়। এরপর রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি নিজে আহত হন এবং অনেক সাহাবী শহীদ হন। এছাড়া মুসলমানদের এমন নিষ্ঠা ও দৃঢ় ঈমানের স্বাক্ষর রাখার সুযোগ হয় যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় কোথাও পাওয়া যায় না।'

উহুদের যুদ্ধ এক বড়ো বিজয় ছিল। এ যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) কীভাবে তালীম ও তরবিয়তের কাজ পুনরায় শুরু করেন– এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'এ যুদ্ধে যদিও অনেক মুসলমান শহীদ হন এবং অনেকেই আহত হন, তবুও একে পরাজয় বলা যায় না। এ এক বিরাট বিজয় ছিল। এমন বিজয় ছিল যে, কিয়ামতকাল পর্যন্ত মুসলমানরা

এ ঘটনাকে স্মরণ করে নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করতে পারে এবং বৃদ্ধি করতে থাকবে। মদীনা পৌঁছানোর পর মহানবী (সা.) তাঁর মূল কাজ অর্থাৎ তালীম, তরবিয়ত ও আত্মসংশোধনের কাজ আরম্ভ করে দেন। কিন্তু তিনি (সা.) এ কাজ সহজভাবে করতে পারেন নি। উহুদের যুদ্ধের পর ইহুদীদের সাহস আরো বেড়ে যায় এবং মুনাফিকরাও আরো বেশি মাথাচাড়া দিতে থাকে আর ধরে নেয় যে, মানুষের পক্ষে ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব। সুতরাং ইহুদীরা তাঁকে (সা.) কষ্ট দিতে শুরু করে; যেমন, মহানবী (সা.) ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্য করে, নোংরা কবিতা লিখে তাদের অসম্মান করা হতো। একবার একটি বিবাদ মেটানোর জন্য তাঁকে (সা.) ইহুদীদের দুর্গে যেতে হয়। তারা মহানবী (সা.) যেখানে বসে ছিলেন এর ওপর থেকে একটি (বড়ো) পাথর ফেলে তাঁকে (সা.) শহীদ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যথাসময়ে তাঁকে (সা.) জানিয়ে দেন এবং তিনি (সা.) কিছু না বলেই সেখান থেকে চলে আসেন। পরবর্তীতে ইহুদীরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেয়। উহুদের যুদ্ধের পরপরই সংঘটিত 'হামরাউল আসাদ' যুদ্ধের বর্ণনা এখানে শেষ হচ্ছে।

পৃথিবী, মুসলমান ও ফিলিস্তিনীদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি দোয়ার আহ্বান করে থাকি। যদিও কিছু লোক মনে করে যে, কিছু সময়ের জন্য যুদ্ধবিরতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিরাজমান অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয়, যুদ্ধবিরতি হলেও ফিলিস্তিনীদের ওপর নির্যাতন শেষ হবে না। এজন্য অনেক দোয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনীদেরকে (দোয়া করার) তৌফিক দিন এবং তারাও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হোক। যাহোক, এ অবস্থা অহংকারীদের দম্ভ চুরমার করার উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এখন এমন মনে হচ্ছে, তাদেরও অহংকার ও দম্ভ চুরমার করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার তকদীর কাজ করতে শুরু করেছে। এ কাজটি কখন পূর্ণমাত্রায় হবে তা আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন। যাহোক, তাদের দম্ভ চুরমার হতে শুরু করেছে। তাদের মধ্য থেকেই তাদের বিরোধী সৃষ্টি হচ্ছে। আমেরিকাতেও বিক্ষোভ হচ্ছে; এখন বিক্ষোভ দমনে শক্তিপ্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু এ স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠবে। সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও আবার তা প্রজ্জ্বলিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর পরাশক্তিগুলোকে কাণ্ডজ্ঞান দান করুন। নিজেদের জন্য তাদের এক নীতি আর অন্যের জন্য ভিন্ন নীতি। আর এ বিষয়গুলো একসময় গিয়ে জাতিসংঘ ভেঙে যাওয়ার কারণও হবে।

যে দ্বিতীয় দোয়ার জন্য আজ বলতে চাই, তা আমার নিজের জন্য। আমার অনেকদিন ধরে হার্টের ভাল্‌ভের সমস্যা ছিল। চিকিৎসকরা ভাল্‌ভ প্রতিস্থাপনের কথা বলতেন, কিন্তু আমি তা এড়িয়ে যেতাম। এখন চিকিৎসকরা বলেন, অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে এসে ঠেকেছে যে, আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। তাই তাদের অনুরোধে সম্প্রতি ভাল্‌ভ প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্, প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। আর একারণে আমি চিকিৎসকদের নির্দেশনা অনুযায়ী কিছুদিন মসজিদেও আসতে পারি নি। আমি আগেই বলেছি, ডাক্তাররা বলেছেন, আল্লাহ্‌র রহমতে চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সফলভাবে ভাল্‌ভ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যতটুকু আয়ু দান করেন তা যেন কর্মময় হয়। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডন কর্তৃক অনূদিত)